নিষ্কাম কর্ম

নীতিদর্শনে ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যের নীতি বা মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। ভগবদ্-গীতাকে আমরা একটি ধর্মগ্রন্থ বলে জানি। কিন্তু এটি এমন একটি গ্রন্থ যেখানে ধর্ম ও নীতিদর্শন পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এখানে একটি নীতিদর্শন গঠিত হয়েছে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার পটভূমিতে। আবার ধর্ম এখানে পূর্ণতালাভ করেছে নীতি দর্শনের মধ্যে।

গীতার যে মুখ্য অংশে তার নৈতিকতার তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে তার পটভূমি বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন। গীতার আরম্ভ হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জুনের বিষাদের মধ্য দিয়ে। ক্ষাত্রধর্মের প্রেরণায় অর্জুন কৌরবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। একই সঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগের ফলস্বরূপ স্বজন হত্যার গ্লানি তাঁকে অস্ত্র ব্যবহারে বাধা দিয়েছে। তিনি মনে করেছেন যে অস্ত্র ত্যাগ করাই তাঁর কর্তব্য। এইভাবে কর্তব্যের দ্বন্দ্ব যখন অর্জুনকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অবসন্ন করে তুলেছিল তখন কৃষ্ণ তাঁকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তারই মধ্যে গীতার নীতিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। অর্জুন কৃষ্ণের কাছে যা চেয়েছিলেন তা হল কর্তব্যের একটা স্পষ্ট নীতি। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, জীবনের যে কোন কর্মক্ষেত্রেই আমরা নিজের কর্ম বা কর্তব্য স্থির করতে পারি না। তাই সাধারণ মানুষের কাছেও কর্তব্যের একটি নীতি প্রয়োজন।

কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য একটি আদর্শের প্রয়োজন হয়। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় এই নৈতিক আদর্শকে নির্ণয় করা চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের সমস্ত কর্মকে সেই আদর্শের অভিমুখী করে তোলাই আমাদের কর্তব্য। আমরা এই কর্তব্য পালন করতে পারি কারণ নিজের কর্মকে কর্তব্যের আদর্শের অভিমুখী করে তোলার সামর্থ্য আমাদের আছে। একথার অর্থ এই যে পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় কর্মের ঐচ্ছিকতাকে স্বীকার করা হয়।

পাশ্চাত্য নীতিদার্শনিক মনে করেন যে মানুষ স্ব-ইচ্ছায় কর্ম পালন করতে পারে

তাই সে-ই তার কর্মের কর্তা। সে তার স্বকৃত কর্মের জন্য দায়ী। এই জন্যই মানুষের কর্মের নৈতিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়। পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে যা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে তা হল মানুষের বিশুদ্ধ অহংবোধ। একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ আছে। আমরা দেখব যে গীতায় যে নীতিদর্শন প্রচারিত হয়েছে তা মানুষের অহংবোধের বিনাশের উপর গড়ে উঠেছে। কর্মের ঐচ্ছিকতা, দায়িত্ব প্রভৃতির মধ্যে যে অহংবোধ পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় প্রকাশিত হয়েছে তাকে বিলুপ্ত করাই গীতার নৈতিকতা।

মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে পাশ্চাত্য নীতিদর্শন ও গীতার নীতিদর্শনের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত গভীর। পাশ্চাত্য মতে আমার সেইরকম কর্মই করা উচিত যা একটি আদর্শে পরিণতি লাভ করে। এই আদর্শকে কখনও সুখ, কখনও আনন্দ, আবার কখনও উপযোগিতা বলা হয়েছে। যে আদর্শ আমার কাম্য সেই লক্ষ্যেই যেন আমার কর্ম পরিণতি লাভ করে। কর্মের পরিণাম বিচার করেই তার নৈতিক মূল্য নির্ধারিত হয়। একটি বিশেষ পরিণাম আশা করেই আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হই।

পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে এইভাবে কর্মকে কামনার দ্বারা অভিষিক্ত বলে দেখা হয়েছে। কিন্তু তার ফলে কর্মের নৈতিকতার হানি হয়নি। কিন্তু গীতার নীতিদর্শন এর বিপরীত। গীতায় কর্মকে বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। এই বন্ধন থেকে মুক্তি মানুষের পরম পুরুষার্থ। যে কর্মের দ্বারা বন্ধন হয় সেই কর্মে নৈতিকতা থাকতে পারে না।

ভারতীয় দর্শনে জীবের সংসারদশাই বন্ধন। যা কিছু মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে তাই বন্ধনের কারণ। এই দিক থেকে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। পাশ্চাত্যে মানুষের সংসারদশাকে কখনও বন্ধন বলে মনে করা হয়নি এবং তার থেকে মুক্তিলাভের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হয়নি। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে জীবের সংসারদশা তার বন্ধন।

এখন প্রশ্ন হল সংসার বন্ধন কেন? ভারতীয় দর্শনে মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্টি মনে করা হয়েছে। ঈশ্বর মানুষের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক। মানুষের সত্তা ঈশ্বরেই আশ্রিত। তার কর্ম ঈশ্বরের দ্বারাই পরিচালিত। আমরা মনে করি যে আমরাই আমাদের কর্মের কর্তা এবং কর্মফলের ভোক্তা। এইভাবে আমাদের যাবতীয় কর্মের পিছনে থাকে অহংবোধ ও কর্তৃত্বের মোহ। মোহযুক্ত কর্মের ক্ষয় হয় না। কর্মের ফলভোগ অনিবার্য। কৃতকর্মের শুভ ও অশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে শত কোটি কল্পেও ভোগ ভিন্ন কর্মক্ষয় হয় না। কর্ম তাই মানুষকে জন্মজন্মান্তরে সংসারে আবদ্ধ করে।

তাহলে কর্মত্যাগ করাই কি আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত? আমাদের পক্ষে কি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করা সম্ভব? কর্ম কি কখনও আসক্তি শূন্য হয়? পাশ্চাত্য নীতিদার্শনিকদের মতে যেখানে আসক্তি নেই, কর্মের ফলভোগের বাসনা নেই

সেখানে কর্মই সম্ভব নয়। আমি যদি কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আসক্ত না হই, কর্মের ফল সম্পর্কে যদি আমি উদাসীন থাকি তাহলে আমার পক্ষে কোন কর্ম করাই সম্ভব হবে না। যেমন সুখবাদী বলেছেন যে আমি কর্মের দ্বারা সুখলাভ করতে চাই বলেই আমি কর্ম করি। আমি যদি নিজে সুখভোগ সম্পর্কে নিস্পৃহ হই তাহলে কোন কাজ করাই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

একথা সত্য যে কোন মূর্খ ব্যক্তিও উদ্দেশ্য ছাড়া কর্ম করে না। কিন্তু আসক্তিবিহীন কর্ম করার জন্য উদ্দেশ্যবিহীন হওয়ার প্রয়োজন নেই। আসলে কর্ম উদ্দেশ্যবিহীন হয় না, তবে আমরা কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিস্পৃহ বা নিরাসক্ত হতে পারি। এরই নাম কর্মসন্ন্যাস যাকে কামনাহীন কর্মসাধনা বলা যেতে পারে। কর্মফল ত্যাগ করাই কর্মসন্ন্যাস। কামনা ত্যাগ করে কর্মফলে উদাসীন হয়ে কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে এই সাধনার সূত্রপাত হয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য দু-প্রকার যুক্তির উল্লেখ করেছেন। এই দু-প্রকার যুক্তিকে যথাক্রমে সাংখ্যরীতি ও যোগরীতি বলা হয়েছে। সাংখ্য যুক্তি অনুসারে আত্মা অবিনশ্বর। যে জন্মলাভ করেছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মমৃত্যুর এই প্রাকৃতিক নিয়মকে অতিক্রম করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র আত্মাই জন্ম-মৃত্যুর অতীত। আত্মাকে যেহেতু বিনাশ করা সম্ভব নয় তাই অর্জুনের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য অনুসরণ করে যুদ্ধে স্বজনহত্যায় অংশ গ্রহণ করাকে পাপাচার বা গার্হিত কর্ম বলা যায় না।

যোগরীতি অনুসারে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করাই আদর্শ কর্মনীতি। কর্মযোগের আদর্শ ব্যাখ্যা করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— যিনি সকল কামনা ত্যাগ করেন তিনি **স্থিতপ্রজ্ঞ**। যিনি সুখ-দুঃখ, ভয়-ক্রোধে সমান উদাসীন তিনি **স্থিতধী**। আর কর্মফলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি যাঁর কাছে সমান তিনি **যোগী**। যোগীই কর্মযোগের আদর্শ।